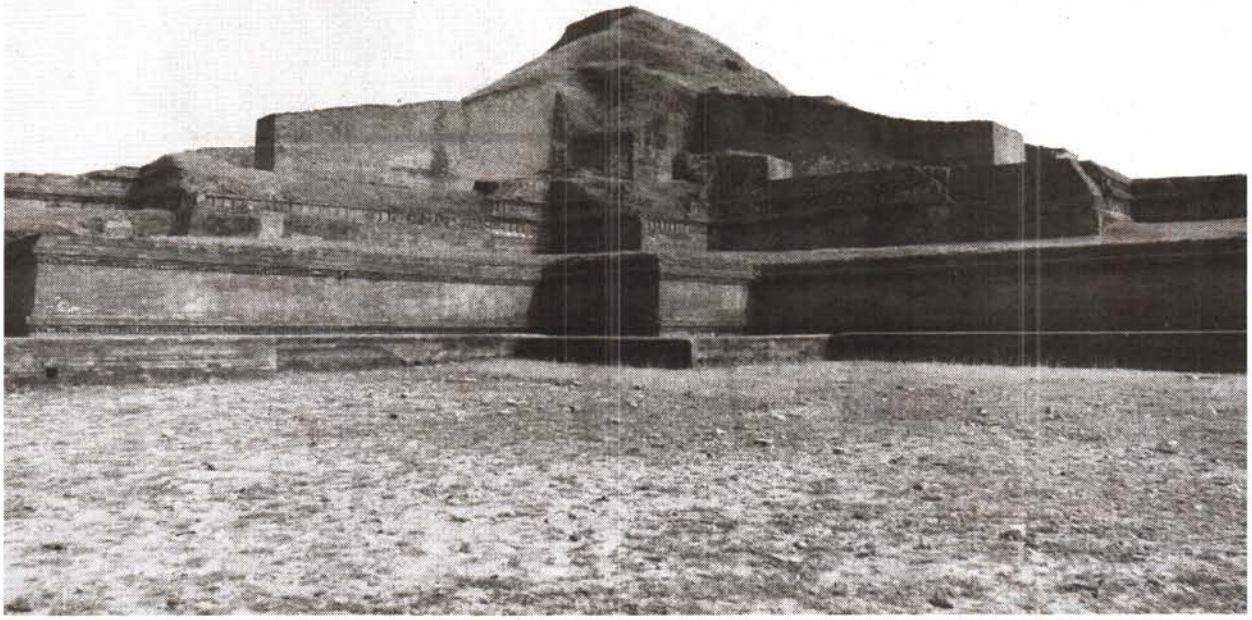

সোমপুর বৌদ্ধ বিহার

ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সোনালী ইটের ওপর দুপুরের রোদের আলো ঝকমক করছে। প্রবেশ মুখ থেকে মূল মন্দির সীমানায় যাওয়া পথের দুইপাশে দেশি ফুলের বাগান পুরাকীর্তিটার সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। বেশ কয়েকটি স্কুল-কলেজের বনভোজনের বাস থেকে বিকট শব্দে মাইকের আওয়াজ প্রথমে ভড়কে দিয়েছিল। সেদিকে খেয়াল না করে মূল মন্দিরের দিকে এগোলাম। বিশাল এলাকা জুড়ে পুরনো দিনের ছোট ছোট ইট দিয়ে নির্মিত প্রশস্ত দেয়াল। দেয়ালের ধ্বংসাবশেষে বসে একটা ছবি না তুললেই নয়

● **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ**

ব্যাংকার বড় ভাইয়ের পোস্টিং হয়েছে নওগাঁয়, বেশ কয়েক বছর। ব্যস্ততার কারণে যাওয়া হয়নি। বগুড়ায় একটা কাজ পড়ে গেল। ভাবলাম কলা তো বেচবই, ফাঁকে রথ দেখাটাও হয়ে গেলে মন্দ হয় না। বগুড়া থেকে নওগাঁ এক ঘণ্টার রাস্তা। কাজ শেষ করে নওগাঁর বাসে চেপে বসলাম। নওগাঁর মহাদেবপুর ভাইয়ার বাসায় পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। ফ্রেশ হয়ে খেয়ে-দেয়ে আরামে চোখ বুজলাম। আসলে চোখ বুজে ভাবছিলাম নওগাঁয় দেখার মতো কী আছে? হঠাৎ মনে পড়ে গেল স্কুলে পড়েছি সোমপুর বৌদ্ধবিহারের কথা। দর্শনীয় স্থান, না দেখেই এত কাছ থেকে ঘুরে যাব তা কি হয়? পরদিন বৌদ্ধবিহার দেখার প্ল্যান করতে করতে ঘুমের রাজ্যে ডুব।

খুব ভোরে ভূরিভোজ সেরে ভাইয়ার থেকে যাতায়াতের প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে ছোট বোনের সঙ্গে রওনা দিলাম। রেকর্ডসংখ্যক টেম্পো, অটো, বাস বদলিয়ে যখন সোমপুর বিহারে উপস্থিত, সূর্যমামা তখন মাঝগগনে পূর্ণ যৌবন নিয়ে তাপ ছড়াচ্ছে। অটো থেকে নেমে ভেতরে যাব, স্থানীয় দোকানদার সামনে দাঁড়ালেন– 'স্যার ভালো খানাপিনার ব্যবস্থা আছে, রেস্টের ব্যবস্থা আছে, আইসেন।' মাথা নেড়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আবার সামনে এলেন, এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'নিরিবিলি রুম আছে স্যার, চাইলে এনজয় করতে পারবেন।' আমার বিব্রত অবস্থা দেখে ছোট বোন নওগাঁর স্থানীয় ভাষায় বলল, 'কিছুই লাগবে না।' লোকটা হতাশ হয়ে ফিরে গেল। মেজাজ খারাপ হলো আমার। একবার ভাবলাম এখান থেকেই ফিরে যাই।

টিকিট কেটে ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সোনালি ইটের ওপর দুপুরের রোদের আলো ঝকমক করছে। প্রবেশমুখ থেকে মূল মন্দির সীমানায় যাওয়া পথের দুই পাশে দেশি ফুলের বাগান পুরাকীর্তিটার সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। বেশ কয়েকটি স্কুল-কলেজের বনভোজনের বাস থেকে বিকট শব্দে মাইকের আওয়াজ প্রথমে ভড়কে দিয়েছিল। সেদিকে খেয়াল না করে মূল মন্দিরের দিকে এগোলাম। বিশাল এলাকাজুড়ে পুরনো দিনের ছোট ছোট ইট দিয়ে নির্মিত প্রশস্ত দেয়াল। দেয়ালের ধ্বংসাবশেষে বসে একটা ছবি না তুললেই নয়। প্রায় দৌড়ে চলে গেলাম মূল মন্দিরের কাছে। মন্দিরের গায়ে অসংখ্য ছবি আঁকা। আমার কেন জানি মনে হলো দেয়ালের প্রত্যেকটা ছবির অর্থ আছে, প্রাচীন মিসরীয় ভাষা হায়ারোগ্লিফের মতো। মন্দিরটি অনেক পুরনো হওয়ায় ভেতরে প্রবেশের রাস্তাগুলো সব ধ্বংসপ্রাপ্ত। কেমন ভুতুড়ে পরিবেশ। একা কোথাও যাওয়ার সাহস পেলাম না। পুরনো ভাঙা ইটের ফাঁকে পা রেখে মন্দিরের চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করলাম। পেছন থেকে ছোট বোন সাহস দিচ্ছিল। প্রায় চূড়ায় উঠে

গিয়েছি, এমন সময় চারদিক থেকে প্রহরী বিকট শব্দে হুইসেল দেয়া শুরু করল। আমাকে নেমে যেতে হবে। সেখানকার আনসারের কাছে জানতে পারলাম, একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল অনেক আগে। সেই থেকে কাউকে ওপরে উঠতে দেয়া হয় না। পুরো মন্দির এলাকা ঘুরতে দুই ঘণ্টার মতো লেগে গেল। বের হওয়ার সময় দেখি ভলভো বাসভর্তি জাপানি পর্যটক এসেছেন। তারা স্থানীয়দের সঙ্গে ছবি তুলছেন বেশ হাসিমুখে। এক সময় উপস্থিত অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েগুলো চেঁচামেচি শুরু করল। তারা এক জাপানি ভদ্রলোককে ডাকছে তাদের সঙ্গে বসে ছবি তোলার জন্য। তাদের আরো ছবি তুলতে বলছে ভেবে জাপানিজ একের পর এক শাটার টিপেই যাচ্ছেন, ছেলে-মেয়েগুলো চেঁচিয়েই যাচ্ছে। আমি এগিয়ে গেলাম। তাকে বললাম, বাচ্চাগুলো আপনার সঙ্গে বসে ছবি তুলতে চাইছে। হেসে আমার হাতে দামি ক্যামেরাটা দিয়ে কচিকাঁচার ভিড়ে মিশে গেলেন। আমিও ননস্টপ ক্লিক ক্লিক...। ছবি তোলা শেষ হলে ক্যামেরা দিয়ে দিলাম। সে নিনজাদের স্টাইলে সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে থ্যাংকস দিয়ে চলে গেলেন।

এতক্ষণে বুঝতেই পারিনি পেটে টান পড়েছে। দ্রুত বাসায় ফিরতে হবে। আবার টেম্পো, অটো, বাস, ভ্যান বদলের পালা।

নবম শতাব্দীর দিকে কৈবর্ত্য সামন্ত রণপতি কর্তৃক পাল সাম্রাজ্য বারবার আক্রান্ত হয়। ফলে সেই সময় পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের যথেষ্ট ক্ষতিসাধিত হয়। প্রায় একই সময়ে বঙ্গাল সৈন্যরা পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার ও মন্দির পুড়িয়ে দিলে খ্রিস্টীয় ১২ শতক সেন রাজাদের হস্তগত হয়।

সেন রাজারা ব্রাহ্মণ ধর্মের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। এভাবে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার ও মন্দির ক্রমে পরিত্যক্ত হয়। ফলে ভিক্ষু ও পূজারিরা পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। এভাবে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার ১২ থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত নির্জন ও পরিত্যক্ত থাকে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভূমিকম্পের ফলে বিহারটি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। এ ধ্বংসাবশেষের বায়ুবাহিত ধুলাবালি ক্রমান্বয়ে জমে বিশাল আকার উঁচু ঢিবি বা পাহাড়ের আকৃতি ধারণ করে। সম্ভবত এভাবে এই স্থানের নামকরণ হয় পাহাড়পুর। ১৮০৭ ও ১৮১২ খ্রিস্টাব্দ ভারত ও শ্রীলঙ্কার প্রত্নতত্ত্ববিদ বুকানন, হ্যামিল্টন ও ওয়েস্টম্যাক পাহাড়পুর পরিদর্শনে আসেন। তারা এসে দেখলেন জঙ্গলের মতো ঢিবি বা পাহাড়।

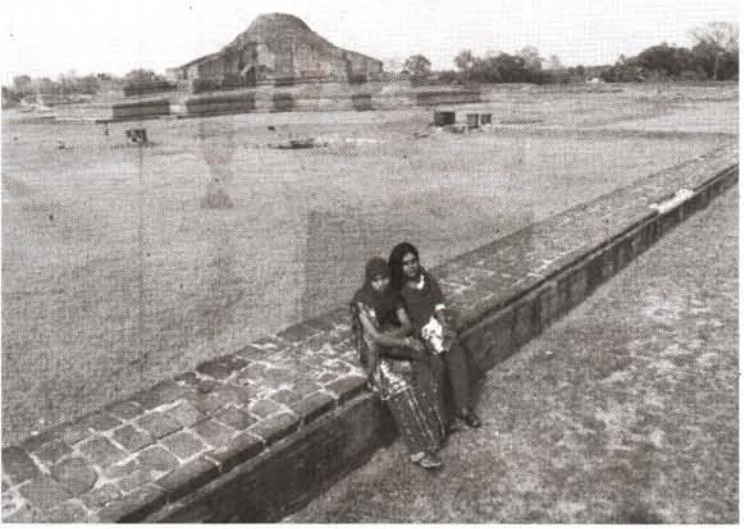

১৯০৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে বৌদ্ধবিহারের ওপর খননকাজ শুরু করেন। কিন্তু নওগাঁর জমিদার বলিহারের রাজা বাধা প্রদান করেন। তখন তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক আইনের আওতায় এনে খননের উদ্যোগ নিলেন। তিনি ১৯২৩ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১১ বছর ধরে খননের ফলে এখানে গুপ্তযুগের তাম্রশাসন (৪৭৯ খ্রি.) খোদাইকৃত প্রস্তরলিপি ও ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলকচিত্র উৎকীর্ণযুক্ত রৌদ্রতাপে শুকানো মাটির সিল, অলঙ্কৃত ইট, বিভিন্ন ধাতব দ্রব্য, রৌপ্যমুদ্রা, মাটির তৈরি বিভিন্ন পাত্রসহ প্রচুর প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া যায়। উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত মাটির সিলের পাঠোদ্ধার হতে জানা যায়, এই বিহারের প্রকৃত নাম সোমপুর মহাবিহার। সোম অর্থ চাঁদ আর পুর অর্থ লোকালয় অর্থাৎ সোমপুর মহাবিহার চাঁদের নগর বা নগরী হিসেবে চিহ্নিত ছিল। পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার উত্তর-দক্ষিণে ৯২২ ফুট, পূর্ব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট। এই বিহারের উত্তর বাহুর মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রধান ও আকর্ষণীয় প্রবেশপথ।

এই প্রধান প্রবেশপথের দুই দিকে পাহারাদার ও অপরদিকে অপেক্ষা কক্ষ রয়েছে। বিহারের উন্মুক্ত আঙিনায় ৪ বাহুতে ১৭৭টি ভিক্ষু কক্ষ আছে। অঙ্গনের কেন্দ্রস্থলে কেন্দ্রীয় মন্দির অবস্থিত। কেন্দ্রীয় মন্দিরের উচ্চতা ৭২ ফুট (বর্তমান)। এই কেন্দ্রীয় মন্দিরের কেন্দ্রীয় ভাগে রয়েছে একটি শূন্য গর্ত কক্ষ। এই কেন্দ্রীয় কক্ষটির চারদিকে দেয়ালের গায়ে আড়াআড়িভাবে নতুন দেয়াল যুক্ত। ওপরের তৃতীয় ধাপে ৪টি কক্ষ ও মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়েছে।

সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা উপাসনা ও ধ্যান করত। অনুমান করা হয় মন্দিরে ছাদের ব্যবস্থা ছিল। ছাদের ছাউনি হিসেবে কাঠ ও পিলার হিসেবে পাথরের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় মন্দির ছাড়া অন্য স্থানে বহুসংখ্যক বিনোদন স্তূপ, কেন্দ্রীয় মন্দিরের আদরা (মডেল) ছোট মন্দির কূপ, রান্নাঘর, ভোজনশালা, ছোট ছোট মন্দির ও অন্য অট্টালিকার সমাবেশ খুব চমৎকার। ১৯৮০ সালের পর সরকার এবং বিদেশি দাতাদের আর্থিক সহায়তায় একটি জাদুঘর নির্মাণ করা হয়। এই জাদুঘরে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা দেশি পর্যটকদের জন্য প্রতি সাপ্তাহিক ছুটি রোববার দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। ■